রাজধানীর শীর্ষ ১০ সোর্সের অপরাধ জীবন

‘সোর্স’। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গোপন সংবাদদাতা। আবার তাদের ‘ইনফরমার’ও বলা হয়ে থাকে। অপরাধ জগতের খোঁজ-খবর আদান-প্রদানের এই পেশায় জড়িতদের অধিকাংশই দুর্ধর্ষ অপরাধী কিংবা অপরাধ জগত থেকে আসা। ‘সোর্স জীবনে’ তাদের যেমনি প্রচুর অর্থ-বিত্ত উপার্জন এবং ‘ক্ষমতা’ প্রদর্শনের সুযোগ থাকে তেমনি সন্ত্রাসী কিংবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে কারো হাতেও খুন হওয়ার ঝুঁকি আছে। সংশ্লিষ্ট সুত্রের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে রাজধানী ঢাকায় দেড় হাজারের বেশি সোর্স আছে। তবে শ’ খানেক সোর্সই সার্বক্ষণিক এই কাজ করে এবং ঘুরেফিরে তারাই আলোচনায় থাকে। এদের মধ্যে আলোচিত শীর্ষ ১০ সোর্সকে নিয়েই আমাদের এ প্রতিবেদন... *রিপোর্ট*

সাজেদুর রহমান ও মোস্তফা সারোয়ার বিপ্লব

পুলিশ, বিডিআর, র‍্যাব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি, ডিবি, এনএসআইসহ সকল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীই অপরাধ শনাক্ত করতে ও অপরাধীদের ধরতে সোর্স ব্যবহার করে। মজার ব্যাপার হল সমাজের দাগী অপরাধীদের একাংশই সোর্স হিসেবে কাজ করে। সোর্স প্রসঙ্গে মহাপুলিশ পরিদর্শকের (আইজিপি) মন্তব্য হচ্ছে, ‘আমরা কাঁটা দিয়ে কাটা তুলি’।

রাজধানী ঢাকায় অপরাধ জগতটি ভয়াবহ, জটিল এবং সেই সঙ্গে কুটিলও। আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়ার মতো তর তর করে ধনী হওয়ার জগৎও বটে। শুধু পেশাদার অপরাধীরাই এই জগতে সরাসরি জড়িত থাকলেও অনেক সময় সমাজের মুখোশধারী কিছু ভদ্রলোকও নেপথ্যে ভূমিকা রাখেন বলে অভিযোগ আছে। যাদের বলা হয়, ‘গড় ফাদার’। ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এ জগতের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মূলত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে সোর্সরা।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, ঢাকা মহানগরীতে বর্তমানে যে দেড় হাজারের মতো সোর্স আছে তাদের অধিকাংশই কোনো না কোনো সমাজ-নিষিদ্ধ তথা অপরাধ জগৎ থেকে এসেছে। বিশেষ করে থানা-পুলিশের খাতায় এদের নাম ঠিকানা মোটামুটি স্পষ্টভাবেই উল্লেখ থাকে। কোনো না কোনো অপরাধে হাজতে কিংবা জেলে থাকার সময়ই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো অফিসার আলোচনা-সমঝোতার মাধ্যমেই সাধারণত সোর্স নির্বাচন করে থাকে। এর ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। যেমন- ডেমরা এলাকার সোর্স শাহিন এসেছে উত্তরাধিকার সূত্রে। তার বাবা থানার রাইটার (দারগার হয়ে মামলা লিখে দিত) ছিলো। সোর্সের একটা অংশের বড় কাজ হচ্ছে ‘থানার ক্যাশিয়ার’ হিসেবে পুলিশের চাঁদা তুলে দেওয়া।

ঢাকা শহরে ২৮টি থানায় খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, অধিকাংশ সোর্সই থানার নির্দিষ্ট কোনো দারোগার পক্ষে কাজ করে। ওই দারোগা যখন যে থানায় যায় তারাও সেই থানায় তখন কাজ করে। বলে রাখা ভালো, তত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাস ছাড়া ঢাকার দারোগাদের সাধারণত বাইরের কোনো জেলায় বদলি কর হয় না। বদলি করা হলেও পরবর্তীতে বিএনপি হোক আর আওয়ামী লীগ হোক তারা ঢাকাতেই ফিরে আসে।

ফলে পুরনো সোর্সদেরও আবার ব্যবহার করে তারা।

গাজী রফিক : মন্ত্রীর নামেও টাকা আদায়

কালো গড়ন। বয়স ৩৫। মুখে চাপ দাড়ি। চলনে বলনে বেশ সাহেবি একটা ভাব

me‡P‡q abx †mvm MvRx iwdK

আছে। প্রথম দর্শনে অপরাধী বলে মনে হবে না। বাড়ি সোনারগাঁ থানার বৈদ্যের বাজার ইউনিয়নের হাড়িয়া গ্রামে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় কোনো না কোনো বারে (মদ খাওয়ার দোকান) আড্ডা দেয়। খুব একটা গুছিয়ে কথা বলতে না পারলেও অনর্গল বলতে পারে।

সে দীর্ঘ এক যুগ ধরে দুটি গোয়েন্দা সংস্থা যথাক্রমে সিআইডি ও ডিবির সোর্স হিসেবে কাজ করে আসছে। রফিকের বড় ভাই গাজী তালেবও পুলিশের সোর্স। দুই ভাইর বিরুদ্ধেই এলাকায় যখন তখন যাকে তাকে সাজানো অজুহাতে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়া ও মিথ্যে মামলায় জড়ানোর ভয় দেখিয়ে চাঁদাবাজি করার পাশাপাশি মাদক ব্যবসা, নারীধর্ষণ ও মাস্তানির অভিযোগ রয়েছে। বড় ভাই আবু তালেবের বিরুদ্ধে সোনারগাঁওয়ের মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গফুর হত্যার মতো গুরুতর অভিযোগ আছে। তবে কৃষিমন্ত্রী এমকে আনোয়ারও জানালেন এক চমকপ্রদ তথ্য। তিনি জানান, আবু তালেব নামে এক ব্যক্তি তার শ্যালক পরিচয় দিয়ে ঢাকাতেই নানা রকম অপরাধ করে। গত ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে আবু তালেব মেম্বার নির্বাচিত হয়! নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাদের এক আত্মীয় জানায়, টাকা আর ক্ষমতা থাকলে যে জেতা যায় তার প্রমাণ আবু তালেব। শুধু তাই নয়, আবু তালেবের বিরুদ্ধে সুকৌশলে নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়ে এবং কারাগারে পাঠিয়ে নিজেই ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিস্ময়কর অভিযোগও আছে।

অন্যদিকে ছোটো ভাই রফিকের বিরুদ্ধে পুরনো ডেমরা থানার হেরোইন স্পট সিটি পল্লী থেকে গতবছর এক বস্তা 'সামারি মানি' অর্থাৎ অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ নিয়েছিল। ওই বস্তার 'সামারি মানি' তথা টাকার পরিমাণ কেউ বলে ৩১ লাখ ৭০ হাজার কেউ বলে ৫০ লাখের বেশি ছিল। বিশাল অঙ্কের এ টাকা আনার কারণে রফিক 'অর্থ কামানোর মেশিন' হিসেবে সিআইডি ও ডিবির সোর্স হিসেবে বেশ আলোচিত। জানা গেছে, সোর্সের কাজ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে খাতির রাখার আড়ালে রফিকের প্রধান পেশা হচ্ছে হুন্ডি ব্যবসা। একটি তথ্যমতে, প্রতিমাসে রফিক অবৈধভাবে কমপক্ষে ৫ লাখ টাকা কামায়। ধূরন্ধর বড় ভাইয়ের ক্ষমতা ও নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে রফিক এখন দোর্দন্ড প্রতাপশালী এক সোর্স। আন্ডারওয়ার্ল্ডসহ বিভিন্ন অপরাধীচক্র ও কালোবাজারির কাছে রফিক এখন যেনো মূর্তিমান এক আতংক। 'পুলিশের চোখে ফাঁকি দিতে পারলেও রফিকের চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব না।' এই মন্তব্য করেন মজিবর নামে ঢাকার সোনা চোরাচালানি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় এক সদস্য।

সোনা চোরাচালানিদের ক্যারিয়ার (বাহক) মজিবর ক্ষোভের সঙ্গে জানায়, 'হালায় ১৩ লাখ ট্যাকার সোনার বিস্কুট ধরাই দিছে।' রফিকও এ কথার সত্যতা স্বীকার করে। এতে তার হতাশা-আক্ষেপও আছে। তার মুখেই শোনা যাক, 'বছর চারেক আগে ঢাকার তাঁতীবাজার থেকে সোনা ধরায়ে দিছিলাম, কথা আছিল আমাকে ১০% সোর্স মানি দিবো। যা ধরায়ে দিছিলাম তাতে আমার ভাগে আসে ৩০ হাজার টেকা। কিন্তু আমারে দিছে মাত্র ১০ হাজার।'

এদিকে সোর্সগিরির মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা বাড়াতে গাজী রফিক ১৪ জনকে মাসিক বেতনে নিয়োগ দিয়েছে। এমনি একজন বেতনভুক্ত সোর্স নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানায়, 'অপরাধীদের সঙ্গে প্রথমে রফিক সমঝোতায় আসার চেষ্টা করে। টাকায় বনিবনা না হলে ডিবি বা সিআইডি নিয়ে হাজির হয় রফিক।' বেতনভুক্ত সোর্সটি আরো জানায়, অবৈধ ডলার, জাল টাকা,

---

পুলিশ সোর্স : গোড়ার কথা

১৮ শতকে ফ্রান্সে পুলিশ শব্দটির উদ্ভবের অনেক আগে থেকেই দেশে দেশে পুলিশি কার্যক্রম চালু ছিল। অতীতে অবশ্য সেনাবাহিনীই অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতো। যেমনটা দেখা গেছে প্রাচীন রোমে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক হয়েছে এ ব্যবস্থা। অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার জন্য গঠিত হয়েছে বিশেষ বাহিনী। ১৬৬৩ সালে লন্ডনে রাতের বেলা রাস্তাঘাটে টহল দেয়ার জন্য নৈশপ্রহরীর ব্যবস্থা করা হয়। জানা মতে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রহরার ব্যবস্থা সেটাই প্রথম। আনুষ্ঠানিকভাবে আইনের আওতায় পুলিশি কার্যক্রম শুরু হয় স্কটল্যান্ডে, ১৮০০ সালের ৩০ জুন। এ ব্যবস্থা পরে ইউরোপজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পুলিশ বাহিনী বোস্টন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠা করেন জোসেফ ওজিয়ার। নিউইর্য়ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৫ সালে।

বিশ্বের তাবৎ পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রম মূলত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত এর একটি হচ্ছে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ। এজন্য গোয়েন্দা পুলিশ নামে বিশেষ বিভাগই থাকে। পুলিশ বাহিনীর চৌকস সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গোয়েন্দা কার্যক্রমে পারদর্শী করে তোলা হয়। পাশাপাশি অপরাধীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মাঠ পর্যায়ে থেকে নিজস্ব লোকবল কাজে লাগানো হয়। অনেক সময় অপরাধীদের মধ্য থেকেই তথ্য সরবরাহের জন্য সোর্স বা ইনফরমার নিয়োগ করা হয়। দন্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের সচরাচর এ ধরনের কাজে লাগানো হয়। পুলিশি ভাষায় এ ধরনের কার্যক্রমকে 'সুপারগ্রাস (Supergrass) বলা হয়।

দন্ডপ্রাপ্ত আসামিদের সাজা মওকুফের শর্তে কিংবা বিশেষ সুবিধার লোভ দেখিয়ে সোর্স হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। যেকোনো পুলিশ বাহিনীর জন্য সোর্স বা ইনফরমার গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সন্ত্রাসীদের আন্ডারগ্রাউন্ড তৎপরতা সম্পর্কে এদের চেয়ে ভালো এবং বিশ্বাসযোগ্য তথ্য অন্য কারো পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। তবে অনেক সময় অপরাধী সোর্সরা 'ডবল এজেন্ট' হিসেবেও কাজ করে। অর্থাৎ দুই পক্ষে থেকে অর্থ গ্রহণ করে তথ্য পাচার করে।

কাজেই সোর্স বাছাই এবং নিয়োগের কাজটি পুলিশ বাহিনীতে বিশেষ গুরুত্ব পায়। নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মতো অনেক পুলিশ বাহিনীই পেশাদার ইনফরমার নিয়োগ করে। পত্রিকার পাতায় রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের নিয়োগ দেয়া হয়। এদের মোটা অঙ্কের বেতনও দেয়া হয়।

হাসান মর্তাজা

অবৈধ পাসপোর্ট, নকল প্রসাধনী কারখানা, নকল ওষুধ কারখানা, নকল ইলেকট্রনিক্স কারখানার মালিকরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে যতটুকু ভয় পায় তার চেয়ে বেশি ভয় পায় গাজী রফিককে। এসব অবৈধ ব্যবসায়ীরা তাকে নিয়মিত চাঁদা দিয়ে থাকে।

রফিকের বড় ভাই আবু তালেব ২০ বছর সোর্সের কাজ করেছে, রফিকও করছে ১২ বছর। ফলে ঢাকার অপরাধী ও অপরাধ জগৎ তাদের দু ভাইর নখদর্পণে। সেজন্যই হয়ত তারা এত বেপরোয়া। আলাপকালে এই প্রতিবেদককে তালেব বলে, 'ভাই আপনি সাপ্তাহিক ২০০০-এর সাংবাদিক এ কথা বললে, ভয় পাই না।' কয়েকজন পরিচিত সাংবাদিকদের নাম উচ্চারণ করে সে আরো বলে, 'ওদের কাছে আমার নাম বলবেন। চিনবে।' আর ছোট ভাই রফিক আরেকধাপ এগিয়েই যেন বলে, 'আমি পুলিশের লোক। আপনার চাইতে অনেক বড় সাংবাদিক আমার চারপাশে থাকে। একসঙ্গে মদ খাই। আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই।' এ সময় তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলতেই রফিক অশ্লিল ভঙ্গিতে বলে, 'আমার নামে লিখে আমার... ছিঁড়তে পারবেন না।'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পুলিশের এই সোর্স গাজী রফিকের ঢাকা শহরে তিনটি দোকান আছে। দীর্ঘদিন ধরে হুন্ডির মতো অবৈধ ব্যবসায় জড়িত। সম্প্রতি মালিবাগ মোড়ের কাছে সিআইডি অফিসের সামনে অত্যাধুনিক 'জামান ফাস্টফুড অ্যান্ড জেনারেল স্টোর' নামে একটি দোকান কিনেছে। রফিকের ব্যাপারে আরো অনুসন্ধানে আমরা গিয়েছিলাম সোনারগাঁও উপজেলার বৈদ্যের বাজারে। সেখানে পৌছালে স্থানীয় বাসিন্দা বকর উদ্দীন জানায়, 'এ এলাকায় ফাইন ফ্যালাট বাড়ি বানাইছে রফিক। ২০ ফুট উঁচু, ১৫ ফুট চওড়া হাজার গজের রাস্তা বানাইছে বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত।'

কালা শাহ আলম : সর্বহারা পার্টি থেকে সোর্স

দুর্ধর্ষ এক সোর্স-এর নাম কালা শাহ আলম। এক সময় সর্বহারা পার্টির সদস্য ছিল। আশির দশকে মাদারীপুর এলাকায় কয়েকটি খুন করে গা ঢাকা দিতে ঢাকায় চলে আসে। ঢাকার ২২ মতিঝিলে সর্বহারা নেতা মহিউদ্দিনের কাছে ওঠে। মহিউদ্দিনের সহায়তায় এবং সোনারগাঁওর বাবুগঞ্জের চেয়ারম্যান খলিল, শামিম ও বাবুলসহ আরো ক'জনকে সহযোগী করে ১৯৮৩ থেকে '৮৫ সাল পর্যন্ত কোতয়ালী থানার ফরাশগঞ্জে

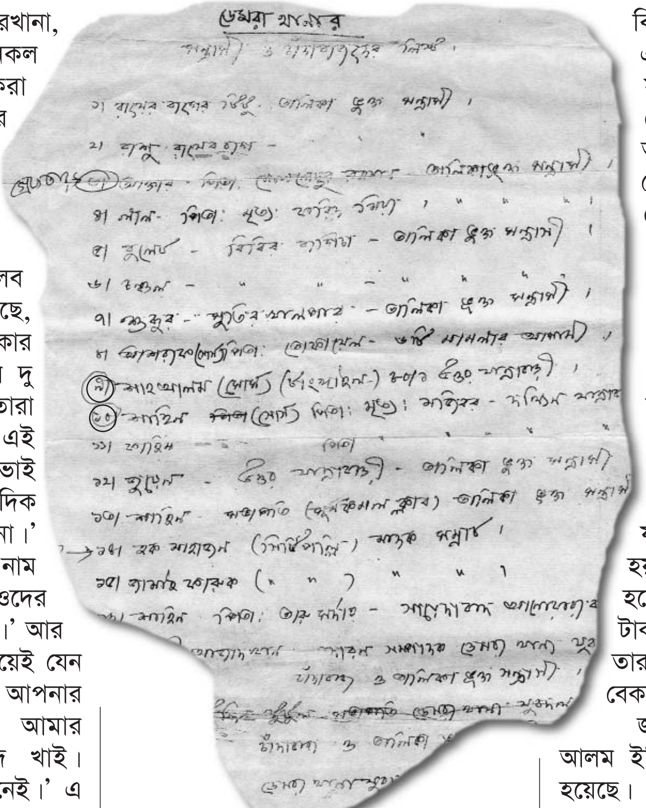
ডেমরা থানার

†Wgiv _vbvi mš¿vmx ZvwjKvq †mvm kvn Avjg I kwnb (ZvwjKvq 9 I 10 †Mvj wPýZ)

জুয়ার বোর্ড চালায়। তখন সে পুরান ঢাকার আবুল ডাকাতের স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ আছে, আবুলকে খুন করেই পরে তার স্ত্রীকে বিয়ে করে শাহ আলম। এরপর অবশ্য কিছুদিন সে আদালতের মুহুরীগিরিও করেছে। ১৯৮৭ সালে এএসআই আছর আলীর হাত ধরে ১ হাজার ৮০০ টাকায় সোর্সের কাজ শুরু করে।

নব্বইয়ের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর শাহ আলম ভাড়াটে সন্ত্রাসী হিসেবে কাজ করতে থাকে। এবার সে গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর এবং ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ছোটবড় বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। সন্ত্রাসী হিসেবে কাজ করতে গিয়েই দৈনিক রূপালি দেশ নামে একটি অখ্যাত পত্রিকার মালিক মনিরের সঙ্গে পরিচয় হয়। বদৌলতে সে সময় নিজেকে সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে দৈনিক রূপালী দেশের মালিক ডেমরা থানার তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হালিমের সঙ্গে শাহ আলমকে পরিচয় করিয়ে দেয়। আবার শাহ আলমেরও নিজস্ব একাধিক সোর্স রয়েছে। তারা জানায়, 'ভাই (শাহ আলম) জীবনে অনেক কষ্টও করছে। ফুটপাতে ঘুমাইছে। না খাইয়া থাকছে। ২০০১ সালে আগস্টের এক বিকেলে ডেমরা থানার পেছনে একদিন দেলোয়ার নামে এক সন্ত্রাসীর লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেলে দায়িত্বরত এসআই মাহমুদ আলম মিরাজ পাশের পান দোকান থেকে চারটা জর্দার কৌটা নিয়ে ভেতর থেকে জর্দা ফেলে দিয়ে টেপ (ইলেকট্রিক টেপ) পেঁচিয়ে বোমার মতো বানিয়ে ওই লাশের পাশেই রাখে। এরপর ছবি তোলে পত্রিকা অফিসে প্রেস রিলিজ পাঠায়। থানায় মামলাও করা হয়। মামলায় শাহ আলম ও জসিমকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে চালান দেওয়া হয়।' শাহ আলমের সহযোগীরা জানায়, 'সোর্সের এটাই বিপদ। পুলিশ যখন যা করতে বলে তাই করতে হয়।' এ প্রসঙ্গে শাহ আলমের বক্তব্য হচ্ছে, 'যখন পুলিশের চাহিদা মতো টাকার যোগান দেয়া যায় না তখনই তারা কোনো না কোনোভাবে সোর্সদের বেকায়দায় ফেলে দেয়।'

জানা গেছে, সোর্সগিরি করে শাহ আলম ইতিমধ্যে প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছে। যেমন- গত মাসেও সে একমাত্র ছেলের নামে একটি ব্যাংকে ২৪ লাখ টাকা জমা রেখেছে। সম্প্রতি সে দুটি নতুন বাস কিনেছে। যাত্রাবাড়ির শহীদ ফারুক সড়কের ইদ্রিস সুপার মার্কেটে বেশ কয়েকটি দোকান আছে তার। সেখানে সে মাদক ব্যবসাও করে। ডেমরা থানার খানিকটা পেছনে একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে স্ত্রী ও এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে থাকে সে। ছেলেকে কিন্ডারগার্টেনে পড়ায়। প্রাইভেট কার যোগে তাকে আনা নেয়া করে।

শাহ আলমের সবচেয়ে বড় সামারি মানির (অবৈধ অর্থ) ঘটনাটি সংঘটিত হয় গত বছর। অর্থের পরিমাণ ছিলো ২৮ লাখ টাকার মতো। গত বছর দারোগা জব্বার ছিলো ডেমরা থানায়। সে সময় শাহ আলম ১৪ হাজার ফেন্সিডিল বোতলের একটি চালান ধরিয়ে দেয়। এরপর বোতলগুলো থানার মালখানায় যখন জমা দেয় তখন তার ভেতরে তরলটুকু (ফেন্সিডিল) বের করে চিটাগুড় ঢুকিয়ে রাখা হয়। এ ঘটনা সম্পর্কে ডেমরার অপর এক সোর্স জানায়, 'ফেন্সির টাকা দিয়েই তো ও (শাহ আলম) গাড়ি কিনেছে।'

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রমতে, গত মাসে আড়াই লাখ টাকার বিনিময়ে দারোগা জাহাঙ্গীরকে ডেমরার 'ভাঙ্গা প্রেস' এলাকায় একটি জায়গা দখল করে দেওয়ার কাজ নেয় শাহ আলম। 'চুক্তি' অনুযায়ী দারোগার কাছ থেকে শাহ আলম আড়াই লাখ টাকার পুরোটাই নিয়ে নেয়। নিজে দেড় লাখ টাকা রাখে আর বাকি এক লাখ ভাঙ্গা প্রেসের

মালিক মাইজুদ্দিন ও ফারুককে দেয়। মজার ব্যাপার হল, দারোগা জাহাঙ্গীর এখন পর্যন্ত জায়গা বুঝে পায়নি। অপরদিকে মালিকরাও তাদের জায়গা দখলে রাখতে পারছে না।

শাহিন : এসি ইকবালের ক্যাশিয়ার

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ৩টা। ঢাকায় বিশ্ব রোডের আমতলা মোড়ে রিকশাটা এসে দাঁড়াতেই পুলিশের মতো লম্বা মোটা কোর্টপরা একজন এসে সামনে দাঁড়ালো।

`Lj I Pv`vewR‡Z wm×n¯ †mvm kvnb

একই সঙ্গে তীব্র আলোর ঝলকানি এসে লাগলো চোখে। আলোর পেছনে থাকা লোকটি বলল, আপনারা নামেন। রিকশা থেকে আমরা (প্রতিবেদকস ও সঙ্গী) নামবো কি না ভাবতেই লোকটি যেনো ধমক দিয়ে বলল, 'নামতে কইতাছি ...আমরা পুলিশে লোক। আমরা নেমে দাঁড়ালাম। আলোও নিভল। রাস্তার সোডিয়াম আলোতে দেখলাম ১৪-১৫ বছরের বয়সী একটা ছেলে এতক্ষণ আমাদের ধমক দিচ্ছে। গায়ে কোনো প্রকার পুলিশের পোশাক নেই। তবে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি টেম্পু দাঁড়িয়ে। সেখানে দু'তিনজন পুলিশের পোশাক পরা লোক দেখা গেল। সামনে দাঁড়ানো ছেলেটি এবার আমাদের জিজ্ঞেস করল, কই থাইকা আয়তেছেন?

: সায়দাবাদ থেকে।

: কই যাইবেন?

: হাজীপাড়া।

: এতো রাতে ক্যা?

: একজন গেস্টকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।

ছেলেটি চতুরতার সঙ্গেই আমাদের রিকশাওয়ালাকেও জিজ্ঞেস করলো কোথা থেকে ভাড়া করেছি, কোথায় যাবো ইত্যাদি। এরপর আবার আমার খুব কাছে এসে চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলো, কি করেন?

: চাকরি করি।

: কই চাকরি করেন?

: পত্রিকায়।

: কার্ড আছে? দেখি?

: আমাদের পরিচয় নিচ্ছেন, আপনারটা বলেন?

: আমি পুলিশের লোক।

: পুলিশের লোক বলতে কি বুঝাচ্ছেন, আপনার পদ কি? নাম কি?

: পদ নেই। ইনফরমার। নাম শাহিন।

: কত দিন ধরে এ পেশায় আছেন?

: ম্যালা দিন। আপনাগো কার্ড দেখান।

কার্ড দেখালাম। উল্টেপাল্টে দেখলো। টেম্পুতে বসে থাকা পুলিশের কাছে গেলো। এরপর ফেরত দিতে এলো। কার্ডটি হাতে নিতে নিতেই বললাম, 'আপনি কি সেই শাহিন যে বর্তমানে ডেমরা ও মতিঝিল জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পুলিশ কমিশনার এ কে এম ইকবাল হোসেনের ক্যাশিয়ার?' কথাটার যেন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ছিলো। শাহিন আমাকে কার্ডটি ফেরত দিলো। কিন্তু এসময় তার হাত কাঁপছিল!

এভাবেই কাকতালীয় ঘটনার মধ্যদিয়ে গভীর রাতে পরিচয় সোর্স শাহিনের সঙ্গে। সে ডেমরা ও মতিঝিল থানার সবচেয়ে পুরনো ও দাপুটে সোর্স। বয়স ৩২ হলেও চেহারায় যেনো এখনো বালকত্ব কাটেনি। এই বয়সেই দুটি বিয়ে করেছে। পুলিশের নিরাপদ বিশ্বস্ত সোর্স হিসেবে খুবই জনপ্রিয়তা আছে শাহিনের। সেই সুবাদে সায়দাবাদে ২টি দোকান কিনেছে। আরো ৪০টির মতো অন্যদের দোকান দখল করে রেখেছে। সে স্থানীয় বিএনপির সঙ্গে

গুপ্ত জীবন প্রকাশ্য মৃত্যু

সোর্সরা চিঁচকে চোর বা পাড়া-মহল্লা-গলিপথের ছিনতাইকারী থেকে শুরু করে অখ্যাত-কুখ্যাত নির্বিশেষে অপরাধীদেরই একটা অংশ। তারা সাধারণত গোপন চলাচলেই অভ্যস্ত। জীবনযাপনেও গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে। কিন্তু তাদের মৃত্যুটা ঠিক গোপন থাকে না। কোনো না কোনোভাবে তা প্রকাশ পায়। প্রাপ্ততথ্য অনুযায়ী ঢাকায় গত কয়েক বছরে ১৪২ জন সোর্স খুন হয়েছে। আর দুষ্কৃতিদের হাতে সহিংসতা-নির্যাতনের শিকার হয়েছে আরো তিন শতাধিক সোর্স।

সোর্সের পরিচয় ফাঁস করে তাদের পরিচয় ফাঁস হলে কখনো কখনো সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পরিণামে সোর্সরা ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের শিকার হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ২০০৩ সালের ১৯ অক্টোবর। রাজধানীর রমনা থানা পুলিশ আদ-দ্বীনের গলি থেকে বস্তাভর্তি অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশের ১৮টি টুকরো উদ্ধার করে। সন্ত্রাসীরা লোকটিকে শুধু হত্যাই করেনি, যাতে চেনা না যায় সেজন্য এসিড মেরে ওই ব্যক্তির মুখমন্ডলও পুড়িয়ে দেয়। চারদিন পর নিহতের স্ত্রী রিনা বেগম মর্গে শনাক্ত করে লাশটি তার স্বামী ডিবি পুলিশের সোর্স বাবুল ওরফে দাঁইত্যা বাবুলের লাশ।

জানা গেছে, এ ঘটনার কিছু দিন আগে গোয়েন্দা পুলিশ তেজগাঁও এলাকা থেকে একটি বড় ধরনের মাদক চালান আটক করে। ওই মাদক আটকের ব্যাপারে তথ্য দিয়েছিল সোর্স বাবুল। পরে ডিবি পুলিশের সঙ্গে মাদক ব্যবসায়ীরা আপোসরফা করে ফেলে। পুলিশ আটক মাদক ফেরত না দিলেও মাদক ব্যবসায়ীদের কাছে সোর্সের নাম বলে দেয়। একজন এসআই পর্যায়ের কর্মকর্তা ওই নামটি প্রকাশ করে বলে জানা যায়। ফলে সোর্স বাবুলের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত মিলন ও সেলিম ১৪ অক্টোবর রাতে ১৬৯/ক/১ কুড়িল বিশ্বরোডের বাসা থেকে তাকে ডেকে নিয়ে যায় এবং বাবুলকে খুন হয়। এরপর পুলিশ আর মিলন ও সেলিমকে এখন পর্যন্ত খুঁজে পায়নি। নিহতের স্ত্রী রিনা বেগম জানান, নৃশংস ওই হত্যা মামলার তদন্ত এক প্রকার থেমে আছে। তার অভিযোগ, বারবার থানায় যোগাযোগ করেও সে পুলিশের আন্তরিকতা সহযোগিতা পায়নি। তাই এখন আর সে খোঁজ নেয় না। রিনার অভিযোগ, পুলিশকে সহযোগিতা করতে গিয়ে তার স্বামী খুন হয়েছে। কিন্তু এরপর কোনো পুলিশ কর্মকর্তা তার খোঁজ নেয়নি। কোনো আর্থিক সহযোগিতাও সে পায়নি।

ডিবির সোর্স জালাল খুন হয় ১৯৯৮ সালে। এই খুনের ঘটনায় তখন ব্যাপক তোলপাড় হয় ডিবিতে। সূত্রাপুরে পুলিশ সোর্স আজমত উল্লাহ (৪২) খুন হয় ২০০৩ সালের ৩০ মার্চ, ২০০১ সালে দারোগা রফিকের সোর্স কবির, কাফরুলের ওসমান ও মুগদাপাড়ার সোর্স কামাল খুন হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে রাজধানীতে মুন্সির টেকের আজমত, সেনপুরের বাবু, ডেমরার ফালান, রিপন, জাহাঙ্গির, কবির, লালবাগের জাহাঙ্গির, বিএনপি বস্তির আলা, সিটিপল্লীর বাবু ও মতিঝিলের বকসু নির্মমভাবে খুন হয়। ডিবির সোর্স বাবুলের ২৩ টুকরা লাশ পাওয়া যায়। এক হিসাবে দেখা যায় মিরপুরে এলাকাতেই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক সোর্স খুন হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, এখন পর্যন্ত কোনো সোর্সেরই খুনের বিচার হয়নি, সাজাও পায়নি কেউ।

জড়িত। ১৯৯০ সালে বাবা মজিবুর রহমানের হাত ধরেই সে মতিঝিল থানায় আসে। তখন সে থানার সেকেন্ড অফিসার জিয়ার সোর্স হয়। পরবর্তীতে অফিসার জিয়া যেখানে যখন যেতো সেখানেই শাহিনকেও নিয়ে যেতো। এখন ওসব অতীত। বছর তিনেক আগে শাহিনের নামে বিস্ফোরক রাখার অভিযোগে মামলা হয়। কিন্তু শাহিন নিজে জেল না খেটে সুকৌশলে শাহিন নামে অপর একজনকে ৫ মাস জেল খাটায়। সোর্স হিসেবে শাহিনের একটি বড় কাজ ছিল কুখ্যাত ডাকাত মকিম গাজিকে ১৯৯১ সালে কোনারপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করানো।

বর্তমানে শাহিন সোর্সগিরির পাশাপাশি সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) এ কে এম ইকবাল হোসেনের ক্যাশিয়ার হিসেবে কাজ করছে। এই এসির নাম করে সে ডেমরা থানার গোলাপবাগের হেলুর বউ, সরোয়ার হোসেন দীপুর বউ, সায়দাবাদের মাদক ব্যবসায়ী বুদ্দিন, জুবায়ের হোসেন টাক্কা, গরুচোর গ্রুপের প্রধান হুমায়ুন ও কবতুর চোরা দিলা এবং ডেমরার হোটেল রোজ ভিলাসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা তুলে নিয়ে আসে। এভাবে শাহিন প্রতি মাসে প্রায় সোয়া দুই লাখ টাকার মতো চাঁদা তোলে বলে জানা যায়। এ টাকার ৪০ শতাংশ পায় শাহিন নিজে। আর বাকিটা পায় কমিশনার নিজে। এ ৪০ শতাংশ হলো শাহিনের। চাঁদা তোলার ব্যাপারে বিষয়টি অবশ্য এসি এ কে এম ইকবাল হোসেন সম্পূর্ণ অস্বীকার করে জানান, তিনি শাহিনকে চেনেন না, এমনকি নামও শোনেননি। অথচ মজার ব্যাপার হল, এই প্রতিবেদক ডেমরার বন্ধন টেলিকম সেন্টারে বসে শাহিনের সঙ্গে কথা বলার সময় তার মোবাইলে এসি ইকবালের ফোন আসে!

শাহিনের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরমধ্যে বেশ কয়েকটি আবাসিক হোটেল দখলের পাশাপাশি যাত্রাবাড়ি গণশৌচাগারের কিছু অংশ দখল করে ফোন-ফ্যাক্সের দোকান করার অভিযোগ আছে। পুলিশের সাথে সখ্যতার সুবাদে এসব হোটেলকে সে যেনো ঢাকার সন্ত্রাসীদের অভয়াশ্রমও বানিয়ে রেখেছে। এছাড়া থানার জিডি ফরমও বিক্রি করে সে।

শাহিন দুটি বিয়ে করেছে। দুই স্ত্রীকে দুটি অত্যাধুনিক ফ্ল্যাটে রাখে। এর মধ্যে এক স্ত্রী মৌসুমী হোটেল ব্যবসার দেখাশুনা করে। শাহিনরা ৪ ভাই। সে বড়। মেজ ফাহিম। গত ৬ ফেব্রুয়ারি নিজের ভাই ফাহিমসহ স্থানীয় সন্ত্রাসীদের নিয়ে শাহিন লুৎফা বেগম নামের একজনের জমি দখল করে। লুৎফা বেগমের বাসা ডেমরা পুলিশ ফাঁড়ি থেকে মাত্র ৫০ গজ দূরে। অথচ দুই ঘণ্টায়ও পুলিশ সেখানে যায়নি। কোনো এক পুলিশ অফিসারের জন্য শাহিন এ জমি দখল করে বলে অভিযোগ আছে। লুৎফা বেগম এ বিষয়ে মামলা করেছে।

সোর্সদের কল্যাণে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যরা 'কৃতিত্বের' পুরস্কার পায়। তেমনি একটি ঘটনা সোর্স শাহিনের মুখেই শুনুন, 'গত ২০০৩ সালে দারোগা আছাদ পিপিএম খেতাব পাইছে আমার কারণে। আমি ২৪টা অস্ত্র উদ্ধার করে দিয়েছিলাম। দারোগা আমারে ১০ হাজার টাকা দিছে। তয় দারোগা পাইছে বড় পদক। আবার দারোগা মাকসুদও বিপিএম পাইছে ২০০৪ সালের, তাও আমার কারণে। দারোগার বুকে লাগে গুলি। সন্ত্রাসী মামুন গুলি চায়। আমি পেছনে থেকে মামুনকে জাপটায়ে ধরি। ফলে দারোগা বেঁচে যায়।' এসব সাহসী কাজে শাহিন সর্বোচ্চ ১০-১২ হাজার টাকা পেয়েছে। আর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পেয়েছে ধন্যবাদ, খেতাব।

অন্যান্য সোর্সদের মতে, শাহিন ডেমরার এসি ইকবালের চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখে, দেখায়। কখনো কখনো পুলিশ অস্ত্র উদ্ধার করে তা থানায় না রেখে শাহিনের কাছে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ আছে।

রফিক আরেকধাপ এগিয়েই যেন বলে, 'আমি পুলিশের লোক। আপনার চাইতে অনেক বড় সাংবাদিক আমার চারপাশে থাকে। একসঙ্গে মদ খাই। আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই।' এ সময় তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলতেই রফিক অশ্লিল ভঙ্গিতে বলে, 'আমার নামে লিখে আমার... ছিঁড়তে পারবেন না।'

সুমন : ওসি রফিকের ড্রেস পরা সোর্স

কাফরুলে কলেজ ছাত্র মমিনকে নৃশংসভাবে খুনের দায়ে অভিযুক্ত মতিঝিল থানার তখনকার ওসি রফিকের সোর্স সুমন। তবে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানাপোড়েনের কারণে মাঝে মাঝে সোর্স সুমনের দিনকাল ভালো যায় না। পুলিশ যখন তখন তাকে ধরে নিয়ে যায়। এক একবার ধরা খেলে এক থেকে দেড় লাখ নেমে যায়। মতিঝিলের ক্লাবপাড়ায় প্রতিদিন কতো কোটি টাকার জুয়া খেলা হয় এবং ব্যাংকপাড়ায় কতো টাকার ডলার চোরাই মার্কেটে কেনা বেচা হয়, 'লিটন-কালাম' গ্রুপ কোন পথে হুন্ডির ব্যবসা করে এবং ডলার কেনাবেচার ক্ষেত্রে কিভাবে প্রতারণা করে আর কোথায়ই বা হেরোইন বিক্রি হয় সবই তার জানা।

আশির দশকে সোর্সের কাজ নেওয়ার আগে সুমন ছিলো মতিঝিলের চিহ্নিত সন্ত্রাসী। খুনের অভিযোগে তখন সুমন জেলও খাটে। ওই সময়ই পুলিশের সোর্স বকসুর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। এরপর বকসুর জুনিয়র হিসেবে কাজ করতে গিয়ে একসময় সে ওসি রফিকের কাছাকাছি আসে। ২০০৪ সালে বকসু রহস্যজনকভাবে খুন হয়। সে বছরই বকসুর বউ রেবেকাকে বিয়ে করে সুমন।

ওসি রফিক যতদিন ছিল, সুমন বেশ দাপটের সঙ্গে চাঁদাবাজি ও হেরোইন বিক্রি করত। কলেজছাত্র খুনের দায়ে রফিক ক্লোজড হলে সুমন বেকায়দায় পড়ে যায়। মতিঝিল থানার অন্য পুলিশ অফিসাররা সুমনকে সোর্স হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে আনিস নামের অপর এক সোর্স জানায়, 'অনেক সময় ওসি রফিকের ড্রেস পরেও সোর্স সুমন ডিউটি করতো। তখন সে নিম্নপদস্থ পুলিশ অফিসারদের পাত্তাই দিতো না। আর ওসি রফিকের কুকীর্তির সঙ্গে সুমন জড়িত থাকায় এবং বর্তমানে তা বিচারাধীন বলে অন্য পুলিশ অফিসারা তাকে ব্যবহার করতে চাইছে না।'

জানা যায়, সুমন বর্তমানে তার জামাই রাহুলকে দিয়ে স্টেডিয়ামের গেটে হেরোইনের ব্যবসা করছে। এ ছাড়া পর্নোসিডি, জাল টাকার কারবারিদের সহায়তা করছে। মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে কেন জড়িয়ে পড়া সম্পর্কে জানতে চাইলে সুমন বলে, 'আমরা এখন ইচ্ছা করলেও ভালো হতে পারুম না। আমাগো পোলাপানদের ভালো করবার পারুম না। পুলিশ যত খারাপ কাম করে, তার সবটাই আমাগো দিয়া করায়। এমনকি কোনো কোনো সময় পুলিশের জন্য জীবনটাও দিয়ে দিতে হয়। ঢাহা শহরে গত ১০/১২ বছরে দেড়শ'র মতো সোর্স মারা পড়ছে। যারা মারা পড়ছে তাদের অধিকাংশই পুলিশের জন্য চাঁদা আনতে যাইয়া খুন হইছে।' সুমন আরো জানায়, 'আমি ওসি রফিকের বউয়ের জন্য কম করে হলেও ১০টি মোবাইল সেট কিন্যা দিছি। ওসি রফিকের চাকরি বাঁচনের লাইগা, তিন-চারবার অস্ত্র কিন্যা সন্ত্রাসীদের থেকে অস্ত্র উদ্ধার দেখাইছি। শুধু ওসি রফিক না, অধিকাংশ পুলিশ অফিসারই ট্যাকার লাইগ্যা হা করে থাকে।'

কথায় কথায় সুমন আরো জানায়, 'বর্তমানে মতিঝিলের ওসি মোতালেব। হে আগে সবুজবাগ থানায় আছিল। ওসি রফিক যাওয়ার পর হে আইছে। হে মতিঝিলের ব্যাংকপাড়া থেকে প্রতি সপ্তায় লিটন-কামাল গ্রুপ থেকে ৭০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা তোলে। মতিঝিল থানায় সিভিল টিমের

এসআই আকবর আলী খানের সোর্স আনিসরে দিয়ে হে তোলে।'

'ফেমাস আরিফ' : দখলকারী ও নকল তারের কারবারি

আরিফের বেশ কয়েকটি নাম। ফেমাস নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক বলে নামের আগে ফেমাস যুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া দাদা আরিফ, বিসিসি আরিফ নামেও অনেকে তাকে চেনে। এই আরিফকে র‍্যাব গত ২০ ফেব্রুয়ারি ৪টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে। অজ্ঞাত কোনো কারণে র‍্যাব এখনো এই গ্রেপ্তারের তথ্য প্রকাশ করেনি বলে শোনা যায়। তবে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে অরিফের সঙ্গে কথা হয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই প্রতিনিধির। তখন সে জানায়, নবাবপুর হচ্ছে ব্যবসায়িক এলাকা। এখানে ইলেকট্রিক তারের বড় বাজার। নকল ইলেকট্রিক তার আর নকল ইলেকট্রনিক্স কারখানার খবরাখবর রাখার চেষ্টা করি। অবশ্য নবাবপুরের স্থানীয় এক ব্যবসায়ী জানায়, 'আরিফ কী নকল তারের খবর দিবো। হে তো নিজেই নকল তারের কারবারি। পুলিশের সোর্সের দাপট দেখায়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করে। নকল তারের ব্যবসা কইরা কোটি কোটি ট্যাকার মালিক হইছে। নবাবপুরে এমন দামি জায়গায় তিন-চারটি বাড়ি আছে। আরো ৪-৫টি প্লট দখল করে রাখছে। ওর সঙ্গে যার বনিবনা হয় না, তারেই কোনো না কোনো অভিযোগে পুলিশি হয়রানি করে। র‍্যাব আহনের পর ওর দাপট আরো বাইরা গেছিল। নবাবপুরে র‍্যাবরা যে কয়টা নকল তারের কারখানা ধরছে, তার সবটায় আরিফের দেয়া খবরে ধরছে।

জানা যায়, নবাবপুরে আরিফের নকল তার কারখানার নাম 'জনতা ক্যাবল'। এখানে সে ইস্টার্ণ, বিআরবি, প্যারাডাইসসহ বিভিন্ন নামকরা তারের নকল করতো। আরিফ এই প্রতিবেদককে জানায়, নবাবপুরে এনার্জি ক্যাবল, ইয়াসিন ক্যাবল, এমএম ক্যাবলসহ শ'খানেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা মূলত নকল তার তৈরি করে। আর নকল ফ্যানের কারখানা আছে ৫০০-র মতো।

আরিফ গ্রেপ্তার হওয়ার পর তার সহযোগীরা চাঁদা তুলতে শুরু করেছে। এই চাঁদার টাকায় আরিফকে আবার মুক্ত করে আনা হবে বলে জানায় তার সহযোগীরা।

ক্লিঙ্কার গিয়াসউদ্দিন : সোর্স-কাম-চোরাচালানি

পুলিশ ও সিআইডি ডিবিসহ সব কটা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সোর্স গিয়াসউদ্দিন। তবে তাকে ক্লিঙ্কার গিয়াসউদ্দিন নামেই ডাকা হয়। অবৈধ ক্লিঙ্কার ব্যবসায়ীদের ধরিয়ে দেওয়ার কারণে তাকে এ নামে ডাকা হয়। তবে সে নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও মুন্সিগঞ্জ জেলার চোরাই তেল ব্যবসার খবরও দেয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে। মধ্যবয়সী এই সোর্সও অবশ্য একটি চোরাচালানি সিন্ডিকেটের প্রধান। ফলে সে রাজধানীর সানারপাড় এলাকায় চারতলা বাড়ি ছাড়াও একই এলাকার সাদ্দাম মার্কেটে তিনটি দোকানের মালিক হয়ে গেছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, অনেক সিমেন্ট কোম্পানি সরকারকে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ক্লিঙ্কার নিয়ে আসে। এদের ধরিয়ে দিতে গিয়ে নিজেও এই ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। একই সঙ্গে সে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে চাঁদাও তোলে।

সোর্স-কাম-চোরাকারবারি গিয়াস নগরীর সন্ত্রাসীদেরও গডফাদার। ২০01 সালে গজারিয়া উপজেলায় আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত এক সভায় তাকে চিহ্নিত সন্ত্রাসী হিসেবে উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তটি আর বাস্তবায়িত হয়নি। নানাভাবে চেস্টা করেও চোরাকারবারি, সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ইনফরমার গিয়াসের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে তার দুটি ছবি সংগ্রহ করা গেছে। একটি ছবি ৮ বছর আগে ডেমরা থানার আসামিদের বোর্ডে পাওয়া যায়। অপরটি পাওয়া যায় একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্যুভেনিরে।

'দেশে অপরাধীদের একটা অংশকে দিয়েই সোর্সের কাজ করানো হয়'

শফিকুল ইসলাম মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার

সাপ্তাহিক ২০০০ : মোস্ট ওয়ান্টেড যারা ধরা পড়েনি...

শফিকুল : শীর্ষ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ চেষ্টা করছে। বিশেষ করে গোয়েন্দা পুলিশ রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানীর বাইরেও অভিযান চালানো হয়েছে। পুলিশের ঘোষিত শীর্ষ সন্ত্রাদের সবাই গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের তৎপরতা চলবে।

২০০০ : কিছু মনে করবেন না। আপনি কি শীর্ষ সন্ত্রাসীদের ধরার ব্যাপারে গঁৎ বাধা কথার বাইরে কি ব্যতিক্রম কিছু বলবেন। যাতে পাঠকরা আপনাদের ওপর আস্থা রাখতে পারে।

শফিকুল : আস্থা তো আর কথায় হয় না, কাজে হয়। সমালোচনার চোখে না দেখে একটু রিয়ালাইজেশন করেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত জামাআতুল মুজাহিদিনের (জেএমবি) ক্যাডারদের গ্রেপ্তারের জন্য গোয়েন্দারা ব্যস্ত ছিলো বেশি। এই সুযোগে মোস্ট ওয়ান্টেড ১২ সন্ত্রাসীর মধ্যে বেশ কয়েকজন ইদানীং আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গত ঈদের সময়ে এদের মধ্যে কয়েকজন ঢাকায় এসে তাদের নেটওয়ার্কের খোঁজ-খবর নিয়ে গেছে এবং ছদ্মবেশে এসে এলাকায় আধিপত্য কেমন আছে তাও দেখেছে। আমরা অনেক খবরই পাচ্ছি। অনেককে ধরার ব্যাপারে অনেকদূর এগিয়েছি। সন্ত্রাসীরা যেকোনো সময় ধরা পড়বে।

২০০০ : খবর পান কোথা থেকে?

শফিকুল : বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে।

২০০০ : সোর্স হিসেবে যাদের ব্যবহার করছেন তারাও তো অপরাধী...

শফিকুল : এ বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা বড় পার্থক্য আছে। সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এ দেশে ভালো মানুষ সোর্সের কাজ করতে চায় না। আমেরিকায় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সোর্স নিয়োগ করে। অনেক শিক্ষিত মানুষ এই কাজে আসে। আমাদের দেশে অপরাধীদের একটা অংশকে দিয়েই কাজটি করিয়ে নেয়া হয়।

২০০০ : সোর্সদের অভিযোগ তারা তাদের প্রাপ্য অর্থ পায় না।

শফিকুল : একটা নাইন এম এম উদ্ধার করে দিলো। বলল দাম সোয়া লাখ। দিতে হবে ২৫ হাজার। আমরা তো সরকারের কাছ থেকে খুব বেশি হলে ৫ হাজার টাকা পাবো। কিন্তু সোর্স এই ৫ হাজারে খুশি থাকে না।

২০০০ : সোর্সরা খুন হয়। সোর্স জালালের মামলার কি অবস্থা?

শফিকুল : অপরাধ জগতে খুন হবে এটাই স্বাভাবিক। তারা নিজেদের কারণেই খুনের শিকার হয়। সোর্স জালালের হত্যার বিচার চলছে।

২০০০ : সোর্সের গুণগত মান উন্নয়নের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কি? এবং কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

শফিকুল : সমগ্র আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থারই পরিবর্তন আসছে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের (পিআরএসপি) আলোকে পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশসহ সর্বক্ষেত্রে আধুনিকায়ন করার কথা ভাবা হচ্ছে। কারণ দেশে অপরাধ যেমন বাড়ছে। সেজন্য তা দমনের ক্ষেত্রেও আইন-শৃঙ্খলা আধুনিকায়ন প্রয়োজন।

পিপন : দৈনিক ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দেয়

পুলিশের আরেক সোর্স পিপন ঢাকার অন্যতম ফেন্সিডিল বিক্রেতা ও অস্ত্র ব্যবসায়ী কমলাপুর টিটিপাড়ার কুখ্যাত নাসিরের লোক হিসেবে পরিচিত। পুলিশের সোর্সগিরির পাশাপাশি নাসিরের মাদক ও অস্ত্রসহ সিএনজি, রিকশাসহ নানা ব্যবসার স্বার্থে নারকোটিক্স বিভাগ ও থানাসহ বিভিন্ন পয়েন্টে মাসে মাসে নির্দিষ্ট হারে চাঁদা পৌঁছে দেয়। ঢাকার বড় সোর্সদের অধিকাংশই অন্যদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে দিলেও পিপন কিন্তু নিজেই চাঁদা দেয়। সে প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০ হাজার চাঁদা দেয়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন মাদক স্পটের মাদকও ধরিয়ে দেয় বলে জানা যায়। পিপনের সঙ্গে কথা বললে সে জানায়, 'নাসিরের কাছে আমি আইছি বলেই তার লোক হইছি এমন না। হের কাছে যেই আইবো সেই তার হইতেই হইবো। এবার বেরাদার্স ক্লাবে নাসির ভাই ৫০ লাখ টাকা দিছে। আশপাশে যত মসজিদ-মাদ্রাসা-পূজামন্ডপ আছে হগলই নাসির ভাইয়ের ট্যাকায়।'

গালকাটা রাসেল : চাঁদাবাজ ও ধর্ষক

গালকাটা রাসেলের ব্যাপারে অভিযোগ খোদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেয়ার পরও কিছুই হয়নি বলে এলাকাবাসী জানায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশ কমিশনার কিংবা র‍্যাব কোনো বাহিনীর কেউই কোনো কিছু করতে পারেনি অথবা করেনি রাসেলের বিরুদ্ধে। পুলিশের সোর্স রাসেলের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, নারী ধর্ষণের অভিযোগ বেশি। এলাকার লোকজন তাকে দু'বার ধরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছিল। কিন্তু সোর্স হওয়ার কারণে দেখা গেছে, সকালে ধরিয়ে দিলে বিকেলে পুলিশের সিভিল টিমের সঙ্গে এসে যারা ধরিয়ে দিয়েছে তাদের নানা রকম হয়রানি করে সে। রাসেল মূলত মোতালেব ওসির সোর্স। ওসি মোতালেব সবুজবাগ থানায় দায়িত্বরত থাকার সময় রাসেলকে সোর্স নিয়োগ করে। মতিঝিল থানায় বদলি হয়ে আসার পর রাসেলকেও এখানে কাজে লাগান হয়। রাসেল বিশেষ করে জাল পাসপোর্ট, ভুয়া ভিসা, জাল স্ট্যাম্প ও আদম ব্যাপারীদের খবরাখবর দেয় পুলিশকে।

তনাই মোল্লা : কারাগারেও নানা অপকর্ম

শরীয়তপুরের এক সময়কার নৌডাকাত তনাই মোল্লা ঢাকায় এসে প্রথমে সন্ত্রাসী গ্রুপের সঙ্গে মিশে মগবাজার, রামপুরাসহ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি করতো। পরবর্তীতে সে ডিবি পুলিশের সোর্স হয়ে যায়। বর্তমানে সে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রয়েছে। তবে কারাগার থেকেও তনাই মোল্লার সোর্সগিরি থেমে নেই। ডিবিকে নিয়মিত

8 eQi Av‡M Avmwg‡`i †ev‡W †Mm‡i Qwe (ev‡q)| †mvm †Mm GLb †KwUc‡Z e¨emvqx (Wv‡b)

কারাগারের ভেতরের খবরাখবর দেয়াই এখন তার কাজ। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরেও সে দিব্যি মাদকদ্রব্য ও সিট কেনাবেচার পাশাপাশি আসামি কেনাবেচাসহ নানা অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শাজাহান : 'সাংবাদিক' ছদ্মবেশে সোর্স

বরিশালের বাকেরগঞ্জের যুবক মোহাম্মদ শাজাহান জীবিকার সন্ধানে ঢাকায় আসে। ঢাকায় সে 'রূপালী দেশ' নামে একটি অখ্যাত পত্রিকায় কাজ নেয়। তবে সেটা অবৈতনিক। কাজ দেওয়ার সময় স্বয়ং পত্রিকাটির সম্পাদকই নাকি তাকে বলে, 'বেতন নেই। সাংবাদিক কার্ড দিচ্ছি। এবার ধান্দা খোঁজো। যেমন ধান্দা করতে পারবে তেমন বেতন পাবে।' সম্পাদকের কথার ইঙ্গিতটি বুঝে ফেলে শাজাহান। ফলে ধান্ধাবাজির লাইনে সে খুব দ্রুত সফলতা পায়। যেমন- একবার অবৈধ কারেন্ট জালের ব্যবহার দেখে তা পত্রিকায় না লিখে থানার ওসি হালিমকে জানিয়ে দেয়। এতে খুশি হয়ে ওসি তাকে পাঁচশ টাকা দেয়। বিষয়টি তারও ভালো লাগে। এটি তার মুখেই শোনা।

তথাকথিত সাংবাদিক হওয়ায় পুলিশের কাছে সে 'সাংবাদিক শাজাহান' হিসেবে পরিচিতি পায়। তবে এখণ সে 'অপরাধ বিচিত্রা' নামে একটি আন্ডার গ্রাউন্ড পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে কাজ করে বলে জানায়। কয়েক মাস আগে সন্ত্রাসীরা তার হাত-পা ভেঙে দেয়। ৬ মাস হাসপাতালে থেকে সম্প্রতি বাসায় ফিরেছে। সন্ত্রাসীরা তাকে নির্যাতনের কারণ জানাতে গিয়ে শাজাহান বলল, 'সন্ত্রাসীদের ধারণা তাদের অনেক অপরাধের খবর আমি বিভিন্ন পত্রিকায় ফাঁস করে দিই।'

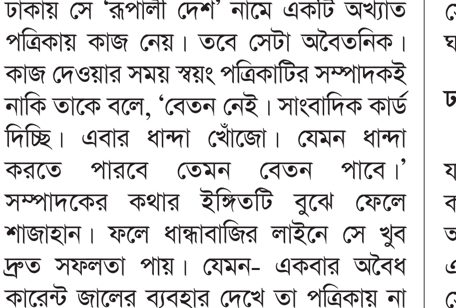

cwZc¶ mš¿vmx‡`i Avµg‡Yi wkKvi †mvm kvRvnvb

৪৮ বছর বয়েসী এই সাংবাদিক নামধারী পুলিশ সোর্স শাজাহানের শরীরটা ইদানিং ভালো যাচ্ছে না। সে কারণে বড় ছেলে সাগরকে নিজ হাতেই তালিম দিচ্ছে কীভাবে ইনফরমারের কাজ করতে হয়। এছাড়া শাজাহানের অধীনে আরো ১০-১২ জন শিষ্য কাজ করছে। কয়েকদিন আগে পিতা-পুত্র মিলে র‍্যাব-১০কে দিয়ে ৮৬ হাজার গজ বিদেশী কাপড় ধরিয়ে দিয়েছে। কাপড় ধরার ওই অভিযানে র‍্যাবের দায়িত্বে ছিলেন মেজর জাহাঙ্গীর। প্রসঙ্গটি তুলতেই শাজাহানের ছেলে সাগর হতাশা ব্যক্ত করে জানায়, প্রায় দেড় কোটি টাকার কাপড় ধরিয়ে দিলাম অথচ তারা একটা টাকাও এখনো পাইনি। 'সাংবাদিক' শাজাহান গত ২০০৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর ১০ কোটি টাকার জাল স্ট্যাম্প উদ্ধার করে। ডিবির তিন নম্বর টিমের এসি কুদ্দুস সে অভিযান চালায়। এ ঘটনাটি সোর্স হিসেবে শাজাহানের ধরিয়ে দেওয়া বড় ঘটনাগুলোর অন্যতম।

ঢাকায় দেড় সহস্রাধিক সোর্স

সংশ্লিষ্ট মহলগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঢাকার সোর্সরা মূলত দুটি গ্রুপে কাজ করে। একটি গ্রুপ রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্ব ও অন্যটি উত্তর-পশ্চিম জোনে কাজ করে। একবার তারা সংগঠিত হওয়ারও চেষ্টা করে। সেটি ২০০৪ সালের ঘটনা। ওই বছরের জুনে মতিঝিল থানা এলাকার শহীদাবাগে সোর্স কোহিনূরের বাসায় এক জন্মদিনের অনুষ্ঠানে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার বড় মাপের ২৫ জন পেশাদার সোর্স একত্রিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন থানা, ডিবি, সিআইডি ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের অনেক কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। ওই অনুষ্ঠানে সোর্সরা ইদ্রিসকে সভাপতি এবং কোহিনূরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৩ সদস্যের একটি কমিটি ঘোষণা করে। তবে এ কমিটি বেশিদিন কার্যকর থাকেনি। এ বিষয়ে অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা উত্তর) জানায়, অপরাধীদের একটা অংশ সোর্সের কাজ করে। তাদের মধ্যে অশিক্ষা কুশিক্ষাই বেশি। একত্রিত হয়ে ভালো কিছু করার তাগিদ বোধ করে না।'

ঢাকায় দেড় সহস্রাধিক সোর্স কাজ করলেও তাদের মধ্যে শ'খানেক সোর্সের নামই বারবার আলোচনায় ওঠে আসে। যেমন :

* রমনা থানায় পুলিশ ডিবি ও কোবরা টিমের সঙ্গে সোর্সের কাজ করে আক্তার। সে মূলত আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য। সে

বিশেষ করে আক্তার কোবরা টিমের এসআই আহসান হাবিব সোর্স হিসেবেই পরিচিত।

* ডেমরা থানা পুলিশের সোর্স আশরাফ। সে এক সময় বরিশালের সর্বহারা পার্টির সদস্য ছিল। এর পর আন্তজেলা ডাকাত দলেও যোগ দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে ৬টি মামলা আছে।

* মুগদাপাড়ার ইদ্রিস ও নুরু সোর্স-কাম-পুলিশের চাঁদাবাজ। জানা যায়, কোনো এখতিয়ার না থাকলেও এসব কাজে তারা হ্যান্ডক্যাপ ও গাড়ি পর্যন্ত ব্যবহার করে।

* পুলিশের সোর্স হাবিব ওরফে হাইব্যার বিরুদ্ধে কামরাঙ্গীচরে আনিস হত্যা এবং টুন্ডা সুমনের বিরুদ্ধে পুরান ঢাকার আমলিগোলার আলিম হত্যাকান্ডসহ একাধিক হত্যা মামলা ঝুলছে। কিন্তু সোর্স হওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে।

* রফিক, হেলাল বাবলা ও ল্যাংড়া সাইদুর সোর্স হিসেবে কাজ করে ডেমরা থানার এসআই মাসুদের সঙ্গে।

* তেজগাঁওয়ের আলমগীর, মিরপুরের লতিফ, মাসুদ ও কাবিল, বংশালের গলাকাটা কামাল বেশ পুরনো সোর্স।

* এছাড়াও নগরীর উল্লেখযোগ্য সোর্সদের মধ্যে রয়েছে- সাত্তার, জালাল, মোল্লা, মজিদ, মামুন, সুমন, মিঠু, সিদ্দিক ফয়সাল, লিটন, মতি, বাদল, আনোয়ার, মামুন, সিদ্দিক, তাজু, নাছির, জলিল, রব, হায়দার, নাজির, রফিক, দেলোয়ার, ল্যাংড়া সাইদুর, বিলাই সাজু, বিলাই চঞ্চল, শামিম, আসলাম, জলিল, দিনা, রাজিনা বাবু, তপন, আজিজ, মোস্তফা, মানিক, দুলাল, নীরব, নাটা কুদ্দুস, ইউসুফ, দাঁতভাঙা শওকত আকবর, নুরু এবং আজমল, জসিম ও আনিস। এদের মধ্যে শেষের তিন সোর্স সহোদর।

ঢাকায় শতাধিক নারী সোর্স

সমাজের অন্যসব ভালো কাজের মতো সোর্সগিরির আড়ালে অপরাধ জগতে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই এক শ্রেণীর নারী। ঢাকা শহরে পুরুষ সোর্সের পাশাপাশি এমনি শতাধিক নারী সোর্সেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে পপী, কহিনুর রোজিনা, দিনা, নাজমা ও ডেমরা থানার জিয়ার মাঠ এলাকার জনৈক আশুর মেয়ে নাজমা ওরফে রাহেলা ও নাসিমা অন্যতম। রাহেলা ওরফে মেয়ে নাজমা সোর্স হিসেবে রাহেলা নামেই পরিচিত। তার স্বামী বাবুলও ছিল সোর্স। স্বামীর মৃত্যুর পরই রাহেলার সোর্স জগতে আগমন। অনুসন্ধানে জানা যায়, রাহেলা বর্তমানে গোপীবাগের হুমায়ুন সাহেবের বাড়ি সংলগ্ন রেলগেটের রাহেলো চারতলা বাড়ির মালিক। এলাকায় রাহেলা এছাড়াও গোপীবাগ, গোলাপবাগ ও ধলপুর এলাকায় ছোট বড় ৫০টিরও বেশি মাদক বিক্রেতার কাছ থেকেও রাহেলা নিয়মিত মাসোহারা নেয়। ইদানীং রাহেলা নিজের মেয়ে শিরিন ও তার জামাই সালাউদ্দিন এবং দুই ছেলে শাহীন ও সেলিমকে সোর্সের কাজে লাগিয়েছে। একই সঙ্গে তারা হেরোইনের ব্যবসাও করছে। তারা একটি বেকারি ও মুরগির ফার্মের মালিক। অন্যদিকে রাহেলার ছোট বোন নাসিমাও সূত্রাপুর থানার পুলিশের সোর্স। সেও এলাকার মাদক বিক্রি করে। কয়েকদিন আগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক অভিযানে নাসিমা ও তার স্বামী বাবুল এক কোটি টাকার হেরোইনসহ ধরা পড়েছে।

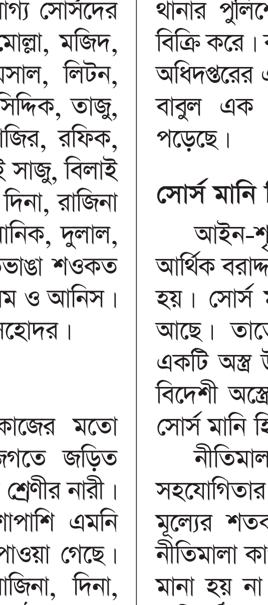

কারাগারের সোর্স তনাই মোল্লা

সোর্স মানি বিতরণ মানদন্ড

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীতে সোর্সদের জন্য আর্থিক বরাদ্দ থাকে। সেটাকে 'সোর্স মানি' বলা হয়। সোর্স মানি বিতরণে একটি নীতিমালাও আছে। তাতে বলা আছে, 'দেশি যেকোনো একটি অস্ত্র উদ্ধার করলে দু'হাজার টাকা এবং বিদেশী অস্ত্রের জন্য ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা সোর্স মানি হিসেবে দিতে হবে।'

নীতিমালা অনুযায়ী মাদক দ্রব্য উদ্ধারে সহযোগিতার জন্য উদ্ধারকৃত মাদকের মোট মূল্যের শতকরা ১৫ ভাগ দিতে হবে। কিন্তু নীতিমালা কাগজে কলমে থাকলেও কোথাও তা মানা হয় না। সোর্স বা ইনফরমারদের 'সোর্স মানি' ঠিকমতো দেয়া হয় না কিংবা দিলেও নীতিমালা অনুযায়ী নয়। ডেমরা থানায় গত ফেব্রুয়ারি মাসে সোর্স মানি বরাদ্দ ছিলো ১৮ হাজার টাকা। এই থানার একজন কর্মকর্তা জানান, সহকারী দারোগা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা ডিসি অফিসে গিয়ে 'সোর্স মানি'র শিটে সই করে এসেছে। কিন্তু এখনো টাকা আসেনি। কারণ এ টাকা আনতে ঘুসও দিতে হয়। ফলে অধিকাংশ সময়ই সোর্স মানি আনা হয় না। সোর্স মানির সিংহভাগ অর্থই ডিসি অফিসের কর্মকর্তারা রেখে দেয়। এ নিয়ে থানার কর্মকর্তারা বাকবিতন্ডায় যায় না। রাজধানীর থানাভিত্তিক সোর্স মানির খোঁজ নিতে গিয়ে ডেমরা থানার মতো অনুরূপ চিত্র দেখা যায় সব জায়গায়। অবশ্য গতবছর প্রতিষ্ঠিত নতুন থানাগুলোতে সোর্স মানির কোনো কারবারই নেই বলে জানায় সংশ্লিষ্টরা।

রাজধানীর থানাগুলোর মধ্যে তেজগাঁও, উত্তরা, কাফরুল, পল্লবী, মিরপুর, গুলশান, বাড্ডা, খিলগাঁও, সবুজবাগ, ক্যান্টনমেন্ট, বিমানবন্দর, শ্যামপুর, সুত্রাপুর, কোতোয়ালি, মতিঝিল, রমনা, হাজারীবাগ, লালবাগ, ধানমন্ডি, ডেমরা ও মোহম্মদপুর এই ২১টি থানার জন্য সোর্স মানির থোক বরাদ্দ থাকে। পুলিশের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগের সহকারী কমিশনার রেবেকা সুলতানা জানান, 'পঞ্চাশ লাখ টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হয়। আগ্নেয়াস্ত্র, মাদক দ্রব্য ও বিদেশী শাড়ি কাপড় আটকের পরিমাণের ভিত্তিতে থানাসমূহে সোর্স মানি বন্টন করা হয়।'

এনএসআই'র অধীনে অনেকগুলো শাখা আছে। লেবার শাখা, স্টুডেন্ট শাখা, সিটি শাখা, মেজর ডিডি-র পিএস শাখা প্রভৃতি। এসব শাখায় সোর্স মানির বরাদ্দ দেয়া হয়। এনএসআইর বর্তমান ডিজি বিগ্রেডিয়ার রেজাকুল হায়দার চৌধুরী নিজেই এ সোর্স মানি দেখেন। তিনি সোর্স মানি প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। সংস্থার সদস্যদের অভিযোগ, 'সোর্স মানি বন্ধ রেখে সেই অর্থ দিয়ে পরিচালকরা বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে। এমনকি বাসার বাজারের জন্য আলাদা গাড়ি ব্যবহার করছে। বর্তমান ডিজির ব্যাপারে একজন সদস্য জানান, প্রমোশন না দেয়ার হুমকি দিয়ে সোর্স মানি আত্মসাৎ করে আমেরিকায় পাচার করছেন।

সিআইডি, ডিবি পুলিশ, এনএসআই ও মাদক দ্রব্যসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সোর্সরা সোর্স মানি পাওয়ার আশা করে না। সিআইডির মাঠ পর্যায়ের এক কর্মকর্তা জানায়, সোর্সদের যে টাকাটা দেয়া হয় তা আমাদের পকেট থেকেই যায় এবং এই টাকাটাও অবৈধভাবেই উপার্জন করা।

সোর্সদের ব্যক্তিগত জীবন

সোর্সদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যদ্দুর জানা যায়, সাধারণত অপরাধের দায়ে থানা হাজত বা কারাগারে আটক থাকার সময়ই সাধারণত আলোচনার মাধ্যমে তাদের সোর্স হিসেবে বেছে নেয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। সোর্সের কাজ নিয়ে অন্য অপরাধীদের ধরিয়ে দেওয়া এবং অস্ত্রসহ অবৈধ পণ্য উদ্ধারে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করলেও সোর্সদের অধিকাংশই অপরাধ জগত থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হয় না। তারা প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো নেশায় আসক্ত থাকে। তাদের জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী 'সোর্স মানি'র বরাদ্দ রাখলেও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে সর্বহারাদের একটা বড় অংশ সোর্সের কাজে নিয়োজিত। ঢাকার অনেক সোর্স স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত বিলাসবহুল বাসায় রাখে। কেউ কেউ ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ায় বলেও জানা যায়। অনেক আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার তথাকথিত সাংবাদিকও সোর্স হিসেবে কাজ করে। নিরাপত্তার কারণে তারা ঘন ঘন বাসস্থান ও মোবাইল ফোনের সিম পরিবর্তন করে।